রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্র-সাহিত্য



# রক্তকরবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ : ১৩৩৩
পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৫২, আষাঢ় ১৩৫৭, শ্রাবণ ১৩৬১, বৈশাখ ১৩৬৪
নূতন সংস্করণ : ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭ : ১৮৮২ শক



প্রচ্ছদ ও গ্রন্থের অন্তর্গত সমুদয় চিত্রবিভূষণ
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

৫.১

## নাট্যপরিচয়

এই নাটকটি সত্যমূলক। এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কি না ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণসংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কী সে সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন, এর ডাকনাম যক্ষপুরী। পণ্ডিতরা বলেন, পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। যে জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুড়ঙ্গ-খোদাই চলছে, এইজন্যেই লোকে আদর ক'রে একে যক্ষপুরী নাম দিয়েছে। এই নাটকে এখানকার সুড়ঙ্গ-খোদাইকরদের সঙ্গে যথাকালে আমাদের পরিচয় হবে।

যক্ষপুরীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করে না। এইটুকু জানি যে, এঁর একটি ডাকনাম আছে—মকররাজ। যথাসময়ে লোকমুখে এই নামকরণের কারণ বোঝা যাবে।

রাজমহলের বাহির-দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা করে থাকেন। কেন তাঁর এমনতরো অদ্ভুত ব্যবহার তা নিয়ে নাটকের পাত্রগণ যেটুকু আলাপ-আলোচনা করেছেন তার বেশি আমরা কিছু জানি নে।

এই রাজ্যের যাঁরা সর্দার তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদর্শী। রাজার তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁদের সতর্ক ব্যবস্থাগুণে খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপুরীর নিরন্তর উন্নতি হতে থাকে। এখানকার মোড়লরা এক সময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দারদের ছাড়িয়ে যায়। যক্ষপুরীর বিধিবিধানকে যদি কবির ভাষায় পূর্ণচন্দ্র বলা যায় তবে তার কলঙ্কবিভাগের ভারটাই প্রধানত মোড়লদের 'পরে।

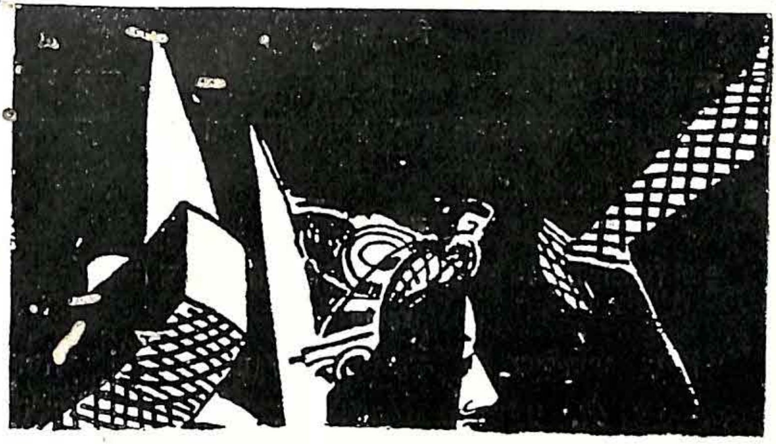
এ ছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নাম গ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্ন গ্রহণ করেন সর্দারের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে।

জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে মাঝে অখাদ্য জাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেট-ভরা বা ট্যাঁক-ভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী-নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন সেইটেকে এই মেয়ে টিঁকতে দেয় না বুঝি।

নাটকের আরম্ভেই রাজার জালের জানলার বাহির-বারান্দায় এই কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে। জানলাটি যে কিরকম তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিকর তারাই তার কলাকৌশল বোঝে।

নাট্যঘটনার যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানলার বাহির-বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে তার অতি অল্পই আমরা জানতে পাই।

# রক্তকরবী



এই নাট্যব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।

নন্দিনী ও কিশোর ( সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বালক )

কিশোর

নন্দিনী! নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী

আমাকে এত করে ডাকিস কেন কিশোর! আমি কি শুনতে পাই নে?

কিশোর

শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তা হলে আনতে যাই।

নন্দিনী

যা যা, এখনি কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে।

কিশোর

সমস্ত দিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।

নন্দিনী

ওরে কিশোর, জানতে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর

তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজেপেতে এক জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী

আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

।কশোর

অমন কথা বোলো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। ওই গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী

কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক ফেটে যায়।

কিশোর

সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী

কিন্তু তোদের এ দুঃখ আমি সইব কী করে!

কিশোর

কিসের দুঃখ! একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।

নন্দিনী

তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেব বল্ তো কিশোর!

কিশোর

এই সত্যটি কর্ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী

আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর

না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।

প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

অধ্যাপক

নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে চাও।

নন্দিনী

কী অধ্যাপক?

অধ্যাপক

ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন নাহয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী

আমাকে তোমার কিসের দরকার ?

অধ্যাপক

দরকারের কথা যদি বললে, ওই চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ওই ধুলোর নাড়ীর ধন— সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে !

নন্দিনী

বারে বারে ওই একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক ?

অধ্যাপক

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচম্‌কা আলো। তুমিই-বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি।

নন্দিনী

অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাৎড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক

আমরা যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

নন্দিনী

তার পরে আবার তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে যে মানুষ পাছে সে কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার-ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।

অধ্যাপক

আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী

এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক

বানিয়ে-তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউ বা ভিখিরি। এসো আমার ঘরে— তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।

নন্দিনী

তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিন রাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন?

অধ্যাপক

আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি। তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

নন্দিনী

না না, এখন না— আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব।

অধ্যাপক

সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

নন্দিনী

আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক

জান নন্দিনী ?— আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।

নন্দিনী

আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি। তোমাকে তো ভয়ংকর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন ?

অধ্যাপক

সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু, তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও ?

নন্দিনী

আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।

অধ্যাপক

একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কী !

নন্দিনী

ওরা জানে না ওরা কী অদ্ভুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব-একটা হাসি হেসে ওঠেন তা হলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক

দেবতার হাসি সূর্যের আলো— তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্দারদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

নন্দিনী

আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনীনদীর মতো। ওই নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। অধ্যাপক, তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক

জানলে কী করে ?

নন্দিনী

হবে হবে, দেখা হবে। খবর এসেছে।

অধ্যাপক

সর্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আসবে !

নন্দিনী

যে পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক

তার মানে, আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে।

নন্দিনী

যখন রঞ্জন আসবে তখন দেখিয়ে দেব, উড়ো খবর কেমন করে মাটিতে এসে পৌঁছল।

অধ্যাপক

রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। থাক্ গে। আমার তো আছে বস্তুতত্ত্ববিদ্যা, তার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়ি গে; আর সাহস হচ্ছে না।

খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে

নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করছে না?

নন্দিনী

ভয় করবে কেন?

অধ্যাপক

গ্রহণের সূর্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণসূর্যকে ভয় করে না। যক্ষপুরী গ্রহণ-লাগা পুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলছি, এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে ওই গর্তগুলো আমাদের সামনে আরো হাঁ করে উঠবে— তবু বলছি, পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি ক'রে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকো গে।

কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে

নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ওই-যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে?

নন্দিনী

কেন, কী করবে তুমি?

অধ্যাপক

কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পরো তার একটা-কিছু মানে আছে।

নন্দিনী

আমি তো জানি নে কী মানে।

অধ্যাপক

হয়তো তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। ওই রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়।

নন্দিনী

আমার মধ্যে ভয়!

অধ্যাপক

সুন্দরের হাতে রক্তের তূলি দিয়েছে বিধাতা। জানি নে, রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি; সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে?— জান? মানুষ না জেনে অমনি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয়।

নন্দিনী

রঞ্জন আমাকে কখনো-কখনো আদর ক'রে বলে রক্তকরবী। জানি নে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা— সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।

অধ্যাপক

তা, আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি।

নন্দিনী

এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে, সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম।

অধ্যাপকের প্রস্থান

সুড়ঙ্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ

গোকুল

একবার মুখ ফেরাও তো দেখি।— তোমাকে বুঝতেই পারলুম না। তুমি কে?

নন্দিনী

আমাকে যা দেখছ তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝবার তোমার দরকার কী?

গোকুল

না বুঝলে ভালো ঠেকে না। এখানে তোমাকে রাজা কোন্ কাজের প্রয়োজনে এনেছে?

নন্দিনী

অকাজের প্রয়োজনে।

গোকুল

একটা কী মন্তর তোমার আছে। ফাঁদে ফেলছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি! তোমার ওই সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে। দেখি দেখি, সিঁথিতে তোমার ওই কী ঝুলছে।

নন্দিনী

রক্তকরবীর মঞ্জরী।

গোকুল

ওর মানে কী?

নন্দিনী

ওর কোনো মানেই নেই।

গোকুল

আমি কিচ্ছু তোমাকে বিশ্বাস করি নে। একটা কী ফন্দি করেছ। আজ দিন না যেতেই একটা-কিছু বিপদ ঘটাবে। তাই এত সাজ। ভয়ংকরী, ওরে ভয়ংকরী!



নন্দিনী

আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন ?

গোকুল

দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের বুঝিয়ে বলি গে, 'সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !'

প্রস্থান

নন্দিনী

জালের দরজায় ঘা দিয়ে

শুনতে পাচ্ছ ?

নেপথ্যে

নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী

আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে

না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো।

নন্দিনী

কুঁদ ফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি।

নেপথ্যে

নিজে পরো।

নন্দিনী

আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্তকরবীর।

নেপথ্যে

আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী

সেই চূড়ার বুকেও ঝর্না ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে। জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।

নেপথ্যে

আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

নন্দিনী

দূর থেকে ওই গান শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে

কিসের গান?

নন্দিনী

পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে— আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।

দেখছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে?

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—
মরি, হায় হায় হায়।

তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল—
ঘরেতে আজ কে রবে গো ? খোলো দুয়ার খোলো।

নেপথ্যে

আমি মাঠে যাব ? কোন্ কাজে লাগব ?

নন্দিনী

মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ।

নেপথ্যে

সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝর্নার মতো নাচতে পারে ? যাও যাও, আর কথা কোয়ো না, সময় নেই।

নন্দিনী

অদ্ভুত তোমার শক্তি। যে দিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ওই হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের ক্ষেত ! আচ্ছা, রাজা, বলো তো— পৃথিবীর এই মরা ধন দিন রাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না ?

নেপথ্যে

কেন, ভয় কিসের ?

নন্দিনী

পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য ব'লে ছিনিয়ে নিয়ে আস তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না?— এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে।

নেপথ্যে

অভিসম্পাত?

নন্দিনী

হাঁ, খুনোখুনি-কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

নেপথ্যে

শাপের কথা জানি নে। এ জানি যে, আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও নন্দিনী?

নন্দিনী

ভারী খুশি লাগে। তাই তো বলছি, আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক।

আলোর খুশি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,
মরি, হায় হায় হায়।

নেপথ্যে

নন্দিনী, তুমি কি জান?— বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ ক'রে রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

নন্দিনী

ও কী বলছ তুমি !

নেপথ্যে

তোমার ওই রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন করে পরতে পারি নে কেন? সামান্য পাপড়ি-ক'টা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে— কোমল ব'লেই কঠিন।...

আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে কর, খুলে বলো তো।

নন্দিনী

সে আর-এক দিন বলব। আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে

না না, যেয়ো না, বলে যাও। আমাকে কী মনে কর বলো।

নন্দিনী

কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো— দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে দেখে তোমার মন যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী

সে কথা থাক্, তোমার তো সময় নেই।

নেপথ্যে

আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে যাও।

নন্দিনী

সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না।

নেপথ্যে

বুঝব। বুঝতে চাই।

নন্দিনী

সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে

যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না।

নন্দিনী

হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে

রঞ্জনের মতোই ?

নন্দিনী

ঘুরে-ফিরে একই কথা ! এ-সব কথা তুমি বোঝ না।

নেপথ্যে

কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি, রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাতটা কী। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী

জাদু বলছ কাকে ?

নেপথ্যে

বুঝিয়ে বলব ? পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা— সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে— সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি, সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।

নন্দিনী

তোমার এত আছে, তবু কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বল কেন ?

নেপথ্যে

আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না— শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই। রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি ক'রে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নন্দিনী

তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছ, তার পরে কেন এমন ছট্‌ফট্ করছ বুঝতে পারি নে।

নেপথ্যে

বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি— তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি— আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

নন্দিনী

তুমি যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।

নেপথ্যে

নন্দিন, এক দিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। এক দিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুম্‌রে গুম্‌রে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে

সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি— সে এর উল্টো।

নন্দিনী

আমার মধ্যে কী দেখছ ?

নেপথ্যে

বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী

বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে

সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হাল্কা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহ নক্ষত্রের দল ভিখারি নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই, নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

নন্দিনী

তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ ; সহজ হয়ে ধরা দাও-না কেন ?

নেপথ্যে

নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পেঁছিয় আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।

নন্দিনী

তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বুঝতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে

আচ্ছা, যেয়ো, কিন্তু জানলার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নন্দিনী

না না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে

কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই ব'লেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি নন্দিন?

নন্দিনী

তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এ-সব বলছ?

নেপথ্যে

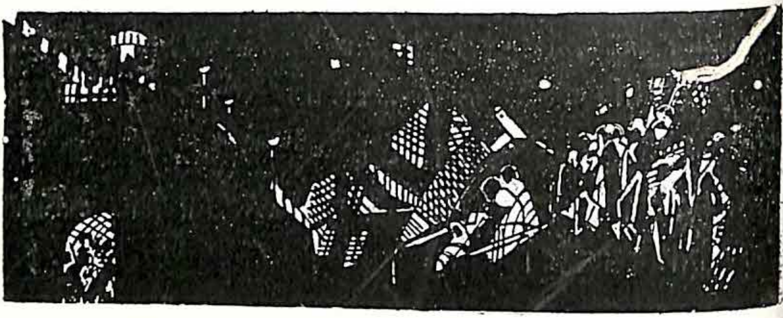
আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই নে। যে দিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনও সময় হয় নি।

নন্দিনী

আমি তোমাকে বলছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আনবে রঞ্জন। সে যেখানে যায়, ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।

নেপথ্যে

তোমার রঞ্জন যে ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কি জানি নে? নন্দিন, তুমি তো আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব?



নন্দিনী

আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে

না। এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

নন্দিনী

ছুটি কী ক'রে মধুতে ভরে তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড়ো সুন্দর।

নেপথ্যে

সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়। আর নয়, যাও, তুমি চলে যাও— নইলে বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী

যাচ্ছি, কিন্তু বলে গেলুম, আজ আমার রঞ্জন আসবে— আসবে— আসবে। কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না।

প্রস্থান

ফাগুলাল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল

আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্রা

ও কী কথা! সকাল থেকেই মদ?

ফাগুলাল

আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে। আজ ধ্বজাপূজা, সেইসঙ্গে অস্ত্রপূজা।

চন্দ্রা

বল কী! ওরা কি ঠাকুর-দেবতা মানে!

ফাগুলাল

দেখ নি? ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির, একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা

তা, ছুটি পেয়েছ ব'লেই মদ? গাঁয়ে থাকতে পার্বণের ছুটিতে তো—

ফাগুলাল

বনের মধ্যে পাখি ছুটি পেলে উড়তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

চন্দ্রা

কাজ ছেড়ে দাও-না, চলো-না ঘরে ফিরে।

ফাগুলাল

ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি?

চন্দ্রা

কেন বন্ধ?

ফাগুলাল

আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোনো মুনফা নেই।

চন্দ্রা

আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট ক'রে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তুঁষ? ফালতো কিছুই নেই?

ফাগুলাল

আমাদের বিশুপাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার। যারা তাকে খায়, তার হাড়-গোড় ক্ষুর-ল্যেজ বাদ দিয়েই খায়। এমন-কি, হাড়কাঠের সামনে তারা যে ভ্যাঁ করে ডাকে সেটাকেও বাহুল্য বলে আপত্তি করে।—

ওই-যে বিশুপাগল গান গাইতে গাইতে আসছে।

চন্দ্রা

কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে গেছে।

ফাগুলাল

তাই তো দেখছি।

চন্দ্রা

ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে— সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।

ফাগুলাল

তাতে আর আশ্চর্যটা কী?

চন্দ্রা

না, আশ্চর্য কিছুই নেই। ওগো, সাবধান থেকো, কোন্ দিন তোমারও গলা থেকে গান বের করবে— সেদিন পাড়ার লোকের কী দশা হবে! মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ ঘটাবে।

ফাগুলাল

বিশুর বিপদ আজ ঘটে নি, এখানে আসবার অনেক আগে থাকতেই ও নন্দিনীকে জানে।

চন্দ্রা

বিশুবেয়াই, শুনে যাও, শুনে যাও। যাও কোথায়? গান শোনাবার লোক এখানেও এক-আধজন মিলতে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না।

বিশুর প্রবেশ ও গান

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে!
লাগল পালে নেশার হাওয়া,
পাগল পরান চলে গেয়ে।

আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্‌ রে বেয়ে।

চন্দ্রা

তবে তো আশা নেই, আমরা যে বড়ো কাছে।

বিশু

আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্‌ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে।

চন্দ্রা

তোমার স্বপন-তরীর নেয়েটি কে, সে আমি জানি।

বিশু

বাইরে থেকে কেমন করে জানবে? আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে তো দেখ নি।

তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী।

গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ

গোকুল

দেখো বিশু, তোমার ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেকছে না।

বিশু

কেন, কী করেছে?

গোকুল

কিছুই করে না, তাই তো খটকা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে আনালে কেন? ওর রকম-সকম কিছুই বুঝি নে।

চন্দ্রা

বেয়াই, এ আমাদের দুঃখের জায়গা; ও যে এখানে অষ্ট প্রহর কেবল সুন্দরীপনা করে বেড়ায়, এ আমরা দেখতে পারি নে।

গোকুল

আমরা বিশ্বাস করি সাদা মোটাগোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারী।

বিশু

যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সব চেয়ে বড়ো সাজা তাই।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, আমরাই যেন মুর্‌খু, কিন্তু এখানকার সর্দার পর্যন্ত ওকে দু চক্ষে দেখতে পারে না, তা জান?

বিশু

দেখো দেখো চন্দ্রা, সর্দারের দু চক্ষুর ছোঁয়াচ যেন তোমাকে

না লাগে ; তা হলে আমাদের দেখেও তোমার চক্ষু লাল হয়ে উঠবে।— আচ্ছা, তুই কী বলিস ফাগুলাল ?

ফাগুলাল

সত্যি কথা বলি, দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারি নে।

গোকুল

বিশুভাই, ওই মেয়েকে দেখে তোমার মন ভুলেছে। সেইজন্যে দেখতে পাচ্ছ না, ও কী অলক্ষণ নিয়ে এসেছে। বুঝতে বেশি দেরি হবে না, বলে রাখলুম।

ফাগুলাল

বিশুভাই, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন।

বিশু

স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চারি দিকেই, এমন-কি, তোমাদের ওই চোখের কটাক্ষে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ জোগাও। জীবলোকে মজুরি করতে হয়, আবার মজুরি ভুলতেও হয়। মদ না হলে ভোলাবে কিসে ?

চন্দ্রা

তাই বৈকি ! তোমাদের মতো জন্ম-মাতালের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভাণ্ড উপুড় করে দিয়েছেন।

বিশু

এক দিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক ; তারা জ্বালা ধরিয়েছে— বলছে 'কাজ করো'। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে— বলছে 'ছুটি ! ছুটি !'

চন্দ্রা

এইগুলোকে মদ বলে নাকি ?

বিশু

প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিন রাত লেগে আছে ! প্রমাণ দেখো। এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিঁধ কাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

গান

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙিন করে।

চন্দ্রা

এসো-না বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশু

সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে খোলা মদের আড্ডায় ! রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ংকর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ— তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।—

তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে।

তবে    আসুক-না সেই তিমিররাতি,

লুপ্তিনেশার চরম সাথি,

তোর    ক্লান্ত আঁখি দিক সে ঢাকি দিক-ভোলাবার ঘোরে।

চন্দ্রা

যাই বল বিশুবেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেছ।— আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয় নি।

বিশু

হয় নি তো কী? তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা' 'সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।

চন্দ্রা

কখ্খনো না।

বিশু

আমি বলছি— হাঁ। ওই-যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ ক'রে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না তুমিও জান না। অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা

আচ্ছা বেশ, তা, চলো-না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশু

সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা-সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি বা দেশে যাও টিঁকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিম-খোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।

ফাগুলাল

আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি তো একদিন পুঁথি পড়ে পড়ে চোখ

খোওয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মতো মুর্‌খুদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন?

চন্দ্রা

এতদিন আছি, এই কথাটির জবাব বেয়াইয়ের কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করা গেল না।

ফাগুলাল

অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশু

কী বলো দেখি।

ফাগুলাল

আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।

বিশু

সবাই জানতিস যদি তো আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন?

ফাগুলাল

এও জানি, এ কাজ তোমার দ্বারা হল না।

চন্দ্রা

এমন আরামের কাজেও টিঁকতে পারলে না বেয়াই?

বিশু

আরামের কাজ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা! বললুম, 'দেশে যাব, শরীর বড়ো খারাপ।' সর্দার বললেন, 'আহা, এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে? তবু চেষ্টা দেখো।' চেষ্টা দেখলুম। শেষে দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি। এখন তোতে আমাতে তফাত এই যে, সর্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা

করে আমাকে তার চেয়েও বেশি। ছেঁড়া কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল

দুঃখ কী বিশুদাদা? আমরা তো তোমাকে মাথায় করে রেখেছি।

বিশু

প্রকাশ পেলেই মারা যাব। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই— সোনাব্যাঙ যতই মক্ মক্ শব্দে কোলাব্যাঙের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পৌঁছয় বোড়া সাপের।

চন্দ্রা

কত দিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে?

বিশু

পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। এক দিনের পর দু দিন, দু দিনের পর তিন দিন। সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি— এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি— এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা?

ফাগুলাল

পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ফ।

বিশু

আমি ৬৯ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।

চন্দ্রা

বেয়াই, ওদের সোনা তো অনেক জমল, আরো কী দরকার ?

বিশু

দরকার ব'লে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে, পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়। নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ওই সোনার তালগুলো যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ।— বুঝতে পারলে না ?

চন্দ্রা

না।

বিশু

মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে যাই ভাগ্যের গণ্ডির মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে করি আমাদের অবাধ ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্তার সেই মোহ লাগে। সে ভাবে, সর্বসাধারণের মাটির টান ওতে পৌঁছয় না, অসাধারণের আশমানে ও উড়ছে।

চন্দ্রা

নবান্নের সময় এল ব'লে, গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চলছে। পায়ে পড়ি, ঘরে চলো। একবার সর্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

বিশু

স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দারকে এখনো চেন নি বুঝি ?

চন্দ্রা

কেন, ওকে দেখে তো আমার বেশ—

বিশু

হাঁ, বেশ ঝক্‌ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না।

চন্দ্রা

ওই-যে সর্দার।

বিশু

তবেই হয়েছে। আমাদের কথা নিশ্চয় শুনেছে।

চন্দ্রা

কেন, এমন তো কিছু বলি নি যাতে—

বিশু

বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা। কাজেই কোন্ কথার টীকে কোন্ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

সর্দারের প্রবেশ

চন্দ্রা

সর্দারদাদা!

সর্দার

কী নাৎনি, খবর ভালো তো?

চন্দ্রা

একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও।

সর্দার

কেন? যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারি খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে। কী হে ৬৯৬, তোমাকে এদের মধ্যে দেখলে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশু

সর্দারজি, তোমার ঠাট্টা শুনে আমোদ লাগছে না। নাচাবার মতো পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে টেনে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো-ব্যাবসা কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে।

সর্দার

নাৎনি, একটা সুখবর আছে। এদের ভালো কথা শোনাবার জন্যে কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে। গোঁসাইজির কাছ থেকে রোজ সন্ধেবেলায় এরা—

ফাগুলাল

না না, সে হবে না সর্দারজি! এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড়ো-জোর মাৎলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।

বিশু

চুপ চুপ ফাগুলাল!

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

সর্দার

এই যে, বলতে বলতেই উপস্থিত। প্রভু, প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন, ভারী দরকার।

গোঁসাই

এই এদের কথা বলছ? আহা, এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েছে ব'লেই সাংসারটা টিকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার ঠাউরে দেখো. যে মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। এ কি কম কথা! আশীর্বাদ করি. সর্বদাই অবিচলিত থাকো; তা হলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হাল্কা হয়ে যাক। হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

চন্দ্রা

আহা, কী মধুর! বাবা, অনেক দিন এমন কথা শুনি নি। দাও দাও, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।

ফাগুলাল

এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারি নে। সর্দার, এত ভক্তি অপব্যয় কিসের জন্যে? প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।

বিশু

ফাগুলাল খেপলে আর রক্ষে নেই। চুপ চুপ!

চন্দ্রা

ইহকাল পরকাল তুমি দু'ই খোওয়াতে বসেছ! তোমার গতি হবে কী! এমন মতি তোমার আগে ছিল না। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপরে ওই নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে।

গোঁসাই

যাই বল, সর্দার, কী সরলতা! পেটে মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি, এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুঝেছ?

সর্দার

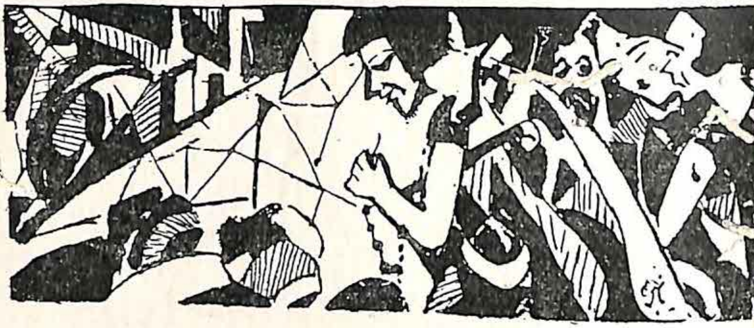
বুঝেছি বৈকি। এও বুঝেছি, উৎপাত বেধেছে কোথা থেকে। এদের ভার আমাকেই নিতে হচ্ছে। প্রভুপাদ বরঞ্চ ও পাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীরা যেন একটু খিট্‌খিট্ শুরু করছে।

গোঁসাই

কোন্ পাড়া বললে সর্দার-বাবা?

সর্দার

ওই-যে ট-ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ট হচ্ছে মোড়ল। মূর্ধন্য-ণয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ওই পাড়ার শেষ।



গোঁসাই

বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়্‌নড়্ করছে, মূর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল ব'লে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা। তবে আসি।

চন্দ্রা

প্রভু, আশীর্বাদ করো, এই এদের যেন সুমতি হয়। অপরাধ নিয়ো না।

গোঁসাই

ভয় নেই, মা-লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

প্রস্থান

সর্দার

ওহে ৬৯ঙ, তোমাদের ও পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখছি।

বিশু

তা হতে পারে। গোঁসাইজি এদের কূর্ম-অবতার বললেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্রা

বিশুবেয়াই, একটু থামো। সর্দার-দাদা, আমার দরবারটা ভুলো না।

সর্দার

কিছুতেই না। শুনে রাখলুম, মনেও রাখব।

প্রস্থান

চন্দ্রা

আহা, দেখলে? সর্দার লোকটি কী সরেস! সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশু

মকরের দাঁতের শুরুতে হাসি, অন্তিমে কামড়।

চন্দ্রা

কামড়টা এর মধ্যে কোথায়?

বিশু

জান না? ওরা ঠিক করেছে, এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আসতে পারবে না।

চন্দ্রা

কেন!

বিশু

সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঙ্কের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।

চন্দ্রা

ওমা! ওদের নিজের ঘরে কি স্ত্রী নেই? তারা কী বলে?

বিশু

তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁশ। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। আমরা তাদের চোখেই পড়ি নে।

চন্দ্রা

বিশুবেয়াই, তোমার ঘরে তো স্ত্রী ছিল, তার হল কী? অনেক দিন খবর পাই নি।

বিশু

যত দিন চরের উচ্চপদে ভর্তি ছিলুম, সর্দারনীদের কোঠাবাড়িতে তার তাস খেলার ডাক পড়ত। যখন ফাগুলালদের দলে যোগ দিলুম, ও পাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হয়ে গেল। সেই ধিক্‌কারে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

চন্দ্রা

ছি, এমন পাপও করে!

বিশু

এ পাপের শাস্তিতে আর-জন্মে সে সর্দারনী হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা

বিশুবেয়াই, দেখো, দেখো, ওই কারা ধুম করে চলেছে। সারে সারে ময়ূরপঙ্খি, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছ! ঝল্‌মল্‌ করছে। কী চমৎকার ঘোড়-সওয়ার! বর্শার ডগায় যেন এক-এক টুকরো সূর্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশু

ওই তো সর্দারনীরা ধ্বজাপূজার ভোজে যাত্রা করেছে।

চন্দ্রা

আহা, কী সাজের ধুম! কী চেহারা! আচ্ছা বেয়াই, যদি কাজ ছেড়ে না দিতে, তুমিও ওদের দলে অমনি ধুম করে বেরতে? আর তোমার সেই স্ত্রী—

বিশু

হাঁ, আমাদেরও ওই দশা ঘটত।

চন্দ্রা

এখন আর ফেরবার পথ নেই ? একেবারে না ?

বিশু

আছে, নর্দমার ভিতর দিয়ে।

নেপথ্যে

পাগল ভাই !

বিশু

কী পাগ্‌লি ?

ফাগুলাল

ওই তোমার নন্দিনীর ডাক পড়ল। আজকের মতো বিশু-দাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা

তোমার বিশুদাদার আশা আর রেখো না। কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি বেয়াই।

বিশু

ভুলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্রা

বেয়াই, অমন উল্‌টিয়ে কথা কও কেন ?

বিশু

তোরা বুঝবি নে। এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ ..র নেই।

ফাগুলাল

বিশুদাদা, পষ্ট করে কথা বলো, নইলে রাগ ধরে।

বিশু

বলছি শোন্, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের—

আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্রা

এ-সব কথা বুঝি নে বেয়াই— একটা কথা বুঝি যে, যে মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ সেই তোমাদের তত বেশি টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর কম, তবু যা হোক তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে রাখলুম, ওই মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে।

চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী

পাগল ভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে?

বিশু

আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে গান শুনতে পাব? এ-যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী

আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু

আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী

তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।

বিশু

তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য লাগে।

নন্দিনী

কেন ?

বিশু

যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম, আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার আমার মাঝ-খানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশু

সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

গান

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখজাগানিয়া।
এল আঁধার ঘিরে,
পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া।

নন্দিনী

বিশু-পাগল, তুমি আমাকে বলছ 'দুখজাগানিয়া' ?

বিশু

তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী। যেদিন এলে যক্ষ-পুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে। রা

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুখজাগানিয়া।

নন্দিনী

তোমাকে একটা কথা বলি পাগল ! যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাই নি।

বিশু

কেন, রঞ্জনের কাছে ?

নন্দিনী

না। দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয় ; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায় ; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তী মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হার-জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে,

কিন্তু কী মনে করে বাজি খেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যা... সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পা...ম না। — তার পরে কতকাল খোঁজ পাই নি। কোথায় তুমি ...লে বলো তো।

বিশু

গান

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার
দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি
এই পারে ওই পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে,
বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল
কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী

সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আনলে ?

বিশু

একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে প'ড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে। আমি নিজেকে ভুলেছিলুম।

নন্দিনী

তোমাকে সে কেমন করে ছুঁতে পারলে ?

বিশু

তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিক্‌হারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায়

না। একদিন পশ্চিমের জানলা দিয়ে আমি দেখছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখছিল সর্দারের সোনার চূড়া। আমাকে কানে কানে বললে, 'ওইখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড়ো তোমার সামর্থ্য।' আমি স্পর্ধা করে বললুম, 'যাব নিয়ে।' আনলুম তাকে সোনার চূড়ার নীচে। তখন আমার ঘোর ভাঙল।

নন্দিনী

আমি এসেছি, এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব।

বিশু

তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে ?— আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না ?

নন্দিনী

এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি।

বিশু

কিরকম দেখলে ?

নন্দিনী

দেখলুম— মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাত-মহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহুদুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হল যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

বিশু

ঘরে ঢুকে কী দেখলে ?

নন্দিনী

ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল ; তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তার পরে যেমন বাজপাখির পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে

আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে ভয় করে না?' আমি বললুম, 'একটুও না।' তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল।

বিশু

তোমার কেমন লাগল?

নন্দিনী

ভালো লাগল। কিরকম বলব? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই, নিশ্চয় ওর মজ্জার মধ্যে খুশি লাগে। ওই একলা প্রাণকে সেই খুশিটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশু

তার পরে ও কী বললে?

নন্দিনী

এক সময় ঝোঁকে উঠে ওর বর্শাফলার মতো দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি তোমাকে জানতে চাই।' আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বললুম, 'জানবার কী আছে? আমি কি তোমার পুঁথি?' সে বললে, 'পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।' তার পরে কিরকম ব্যগ্র হয়ে উঠে বললে, 'রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কিরকম ভালোবাস?' আমি বললুম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে— পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।' মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনলে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?' আমি বললুম, 'এখ্‌খনি।' ও যেন রেগে গর্জন করে বললে, 'কখ্‌খনো না!' আমি বললুম, 'হাঁ পারি।'

'তাতে তোমার লাভ কী?' বললুম, 'জানি নে।' তখন ছট্‌ফট করে বলে উঠল, 'যাও, আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কা[illegible] নষ্ট কোরো না।' মানে বুঝতে পারলুম না।

বিশু

সব কথার পষ্ট মানে ও জানতে চায়। যেটা ও বুঝতে পারে না সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে দেয়, তাতেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী

পাগল ভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার?

বিশু

যেদিন ওর 'পরে বিধাতার দয়া হবে সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী

না না, তুমি জান না, বেঁচে থাকবার জন্যে ও কিরকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশু

ওর বাঁচা বলতে কী বোঝায়, সে তুমি আজই দেখতে পাবে— জানি নে সইতে পারবে কি না।

নন্দিনী

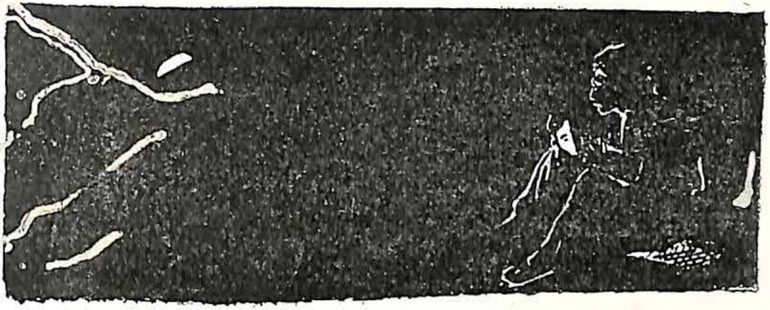
ওই দেখো পাগল ভাই, ওই ছায়া। নিশ্চয় সর্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনেছে।

বিশু

এখানে তো চার দিকেই সর্দারের ছায়া, এড়িয়ে চলবার জো কী?— সর্দারকে কেমন লাগে?

নন্দিনী

ওর মতো মরা জিনিস দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিক্‌লিক্ করছে।



বিশু

প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।

নন্দিনী

চুপ করো, শুনতে পাবে।

বিশু

চুপ করাটাকেও যে শুনতে পায়, তাতে আপদ আরো বাড়ে। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি তখন কথায়-বার্তায় সর্দারকে সামলে চলি। তাই ওরা আমাকে অপদার্থ ব'লে অশ্রদ্ধা করেই বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের দণ্ডটা দিয়েও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু, পাগলি, তোর সামনে মনটা স্পর্ধিত হয়ে ওঠে, সাবধান হতে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী

না না, বিপদকে তুমি ডেকে এনো না।— ওই-যে সর্দার এসে পড়েছে।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার

কী গো ৬৯ঙ, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছ-বিচার নেই ?

বিশু

এমন-কি, তোমার সঙ্গেও শুরু হয়েছিল, বাছ-বিচার করতে গিয়েই বেধে গেল।

সর্দার

কী নিয়ে আলাপ চলছে ?

বিশু

তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।

সর্দার

বল কী, এত সাহস ! কবুল করতেও ভয় নেই ?

বিশু

সর্দার, মনে মনে তো সব জানোই। খাঁচার পাখি শলাগুলোকে ঠোকরায়, সে তো আদর করে নয়। এ কথা কবুল করলেই কী, না করলেই কী।

সর্দার

আদর ক'রে না, সে জানা আছে— কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না সেটা এই কয়েক দিন থেকে জানান দিচ্ছে।

নন্দিনী

সর্দারজি, তুমি যে বলেছিলে, আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই, কথা রাখলে না ?

সর্দার

আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী

সে আমি জানতুম। তবু আশা দিলে যখন, জয় হোক তোমার সর্দার— এই নাও কুন্দফুলের মালা।

বিশু

ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলে ! রঞ্জনের জন্যে রাখলে না কেন ?

নন্দিনী

তার জন্যে মালা আছে।

সর্দার

আছে বৈকি, ওই বুঝি গলায় ঢুলছে ? জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ যে হাতের দান ; আর বরণমালা ওই রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো ভালো, হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে। হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে।

প্রস্থান

নন্দিনী

জানলার কাছে

শুনতে পাচ্ছ ?

নেপথ্যে

কী বলতে চাও বলো।

নন্দিনী

একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

নেপথ্যে

এই এসেছি।

নন্দিনী

ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে

বারবার কেন মিছে অনুরোধ করছ ? এখনো সময় হয় নি।—

ও কে তোমার সঙ্গে ? রঞ্জনের জুড়ি নাকি ?

বিশু

না রাজা, আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না— আমি অমাবস্যা।

নেপথ্যে

তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার ? নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে ?

নন্দিনী

ও আমার সাথি, ও আমাকে গান শেখায়। ওই তো শিখিয়েছে—

গান

'ভালোবাসি ভালোবাসি'

এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।

নেপথ্যে

ওই তোমার সাথি? ওকে এখনি যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি তা হলে কী হয়?

নন্দিনী

তোমার গলার সুর ও কিরকম হয়ে উঠল? থামো তুমি। তোমার কেউ সঙ্গী নেই নাকি?

নেপথ্যে

আমার সঙ্গী? মধ্যাহ্নসূর্যের কেউ সঙ্গী আছে?

নন্দিনী

আচ্ছা, থাক্ ও কথা। মা গো, তোমার হাতে ওটা কী?

নেপথ্যে

একটা মরা ব্যাঙ।

নন্দিনী

কী করবে ওকে নিয়ে?

নেপথ্যে

এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এইভাবে কী করে টিঁকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল

না ; পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিঁকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয় ?

নন্দিনী

আমারও চারি দিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে

তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে চাই।

নন্দিনী

জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না।

নেপথ্যে

ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

নন্দিনী

তাতে কী হবে ?

নেপথ্যে

আমি জানতে চাই।

নন্দিনী

তুমি যখন জানবার কথা বলো, কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে

কেন ?

নন্দিনী

মনে হয়, যে জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে

তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি সময় নষ্ট কোরো না।— না, না, একটু রোসো। তোমার অলকের

থেকে ওই-যে রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে, আমাকে দাও।

নন্দিনী

এ নিয়ে কী হবে?

নেপথ্যে

ওই ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ওই যেন আমারই রক্ত-আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি; আবার ভাবছি নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ওই মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তা হলে—

নন্দিনী

তা হলে কী হবে?

নেপথ্যে

তা হলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।

নন্দিনী

একজন মানুষ রক্তকরবী ভালোবাসে, আমি তাকে মনে করে ওই ফুলে আমার কানের দুল করেছি।

নেপথ্যে

তা হলে বলে দিচ্ছি, ও আমারও শনিগ্রহ, তারও শনিগ্রহ।

নন্দিনী

ছি ছি, ও কী কথা বলছ! আমি যাই।

নেপথ্যে

কোথায় যাবে?

নন্দিনী

তোমার দুর্গদুয়ারের কাছে বসে থাকব।

নেপথ্যে

কেন?

নন্দিনী

রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে, দেখতে পাবে আমি তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে যদি দ'লে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তাকে একটুও চেনা না যায়!

নন্দিনী

আজ তোমার কী হয়েছে? আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন?

নেপথ্যে

মিছিমিছি ভয়? জান না আমি ভয়ংকর?

নন্দিনী

হঠাৎ তোমার এ কী ভাব? লোকে তোমাকে ভয় করে এইটেই দেখতে ভালোবাস? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে— সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁৎকে উঠলে সে ভারী খুশি হয়। তোমারও যে সেই দশা। আমার কী মনে হয় সত্যি বলব? রাগ করবে না?

নেপথ্যে

কী বলো দেখি।

নন্দিনী

ভয় দেখাবার ব্যাবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না!

নেপথ্যে

কী বলছ নন্দিনী ?

নন্দিনী

এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাকত, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত, তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে

তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। এতদিন যা-কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারই রাশ-করা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তার পরে—

নন্দিনী

তার পরে কী ?

নেপথ্যে

তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে— যাও যাও, এখনি পালিয়ে যাও, এখনি।

নন্দিনী

এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কী করতে পারো করো। অমন বিশ্রী করে গর্জন করছ কেন ?

নেপথ্যে

আমি যে কী অদ্ভুত নিষ্ঠুর তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্তনাদ শোন নি ?

নন্দিনী

শুনেছি, সে কিসের আর্তনাদ ?

নেপথ্যে

সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকানো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই— সেই-সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী

কেন তুমি নিষ্ঠুর?

নেপথ্যে

আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাই নে তাকে দয়া করতে পারি নে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব এক রকম করে পাওয়া।

নন্দিনী

ও কী, অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করছ কেন?

নেপথ্যে

আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি। পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।

নন্দিনী

আচ্ছা যাই, আর তোমাকে রাগাব না।

নেপথ্যে

শোনো শোনো, ফিরে এসো তুমি। নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী

কী, বলো।

নেপথ্যে

সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্না। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর

কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারী ইচ্ছে করছে। তুমি জানো না, আমি কত শ্রান্ত।

নন্দিনী

তুমি কি কখনো ঘুমোও না?

নেপথ্যে

ঘুমোতে ভয় করে।

নন্দিনী

তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিই—

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নেপথ্যে

থাক্ থাক্, থামো তুমি, আর গেয়ো না।

নন্দিনী

সেই সুরে সাগরকূলে
বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন হাসি।

পাগল ভাই, ওই-যে মরা ব্যাঙটা ফেলে রেখে দিয়ে কখন পালিয়েছে। গান শুনতে ও ভয় পায়!

বিশু

ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকল রকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।—

পাগলি, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখছি, মনের মধ্যে কোন্ ভাবনার অরুণোদয় হয়েছে আমাকে বলবি নে?

নন্দিনী

মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁচেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে।

বিশু

নিশ্চয় খবর এল কোন্ দিক থেকে?

নন্দিনী

তবে শোনো বলি। আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠপাখি এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব, আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি, উত্তুরে হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।

বিশু

তাই তো দেখছি, আর দেখছি কপালে আজ কুঙ্কুমের টিপ পরেছ।

নন্দিনী

দেখা হলে এই পালক আমি তার চুড়োয় পরিয়ে দেব।

বিশু

লোকে বলে, নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে।

নন্দিনী

রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে।

বিশু

পাগ্‌লি, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে।

নন্দিনী

না, আজ তোমাকে কাজ করতে দেব না।

বিশু

কী করব বলো।

নন্দিনী

গান করো।

বিশু

কী গান করব ?

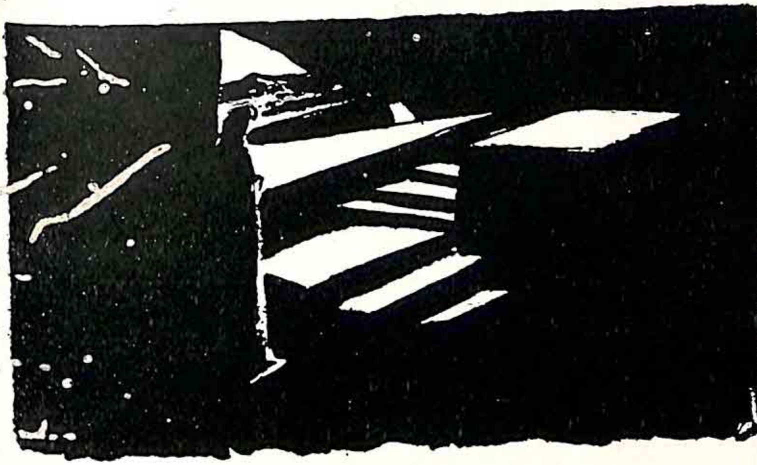
নন্দিনী

পথ চাওয়ার গান।

বিশু

গান

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে
কখন তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে!
আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে সেই আলোকে
দেখা হবে, এক পলকে
সব আবরণ যাবে যে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।



নন্দিনী

পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয় অনেক তোমার পাওনা ছিল, কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারি নি।

বিশু

তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে প'রে চলে যাব। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।—

এখন কোথায় যাবি ?

নন্দিনী

পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। সেইখানে বসে আবার তোমার গান শুনব।

উভয়ের প্রস্থান

সর্দার ও মোড়লের প্রবেশ

সর্দার

না, এ পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না।

মোড়ল

ওকে দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সুড়ঙ্গে কাজ করাতে দিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দার

তা, কী হল ?

মোড়ল

কিছুতেই পারা গেল না। সে বললে, 'হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই !'

সর্দার

অভ্যেস এখনি শুরু করাতে দোষ কী ?

মোড়ল

সে চেষ্টা করা গেল। বড়ো মোড়ল এল কোটালকে নিয়ে। মানুষটার ভয় ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোষ, আমি তাই খসাতে এসেছি।'

সর্দার

ওকে সুড়ঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন ?

মোড়ল

দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উল্টো হল— খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে ; বললে, 'আজ আমাদের খোদাই-নৃত্য হবে।'

সর্দার

খোদাই-নৃত্য ? তার মানে কী ?

মোড়ল

রঞ্জন ধরলে গান। ওরা বললে, 'মাদল পাই কোথায় ?' ও বললে, 'মাদল না থাকে, কোদাল আছে।' তালে তালে কোদাল পড়তে

লাগল ; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি! বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, 'এ কেমন তোমার কাজের ধারা ?' রঞ্জন বললে, 'কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।'

সর্দার

লোকটা পাগল দেখছি।

মোড়ল

ঘোর পাগল। বললুম, 'কোদাল ধরো।' ও বলে, 'তার চেয়ে বেশি কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও।'

সর্দার

তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবেরগড়ে এল কী করে ?

মোড়ল

কী জানি প্রভু! শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি, কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে— ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল ক'রে চেহারা বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সর্দার

ও কী! ওই-না রঞ্জন রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে ? একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মোড়ল

তাই তো! কখন্ গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে! ভেল্‌কি জানে।

সর্দার

যাও, এই বেলা ধরো গে ওঁকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।

মোড়ল

দেখতে দেখতে ওর দল ভারী হয়ে উঠছে। কখন্ আমাদের শুদ্ধ নাচিয়ে তুলবে।

ছোটো সর্দারের প্রবেশ

সর্দার

কোথায় চলেছ ?

ছোটো সর্দার

রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি।

সর্দার

তুমি কেন ? মেজো সর্দার কোথায় ?

ছোটো সর্দার

ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, 'আমরা সর্দাররা কিরকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।'

সর্দার

শোনো, ওকে বাঁধতে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোটো সর্দার

ও তো রাজার ডাক মানতেই চায় না।

সর্দার

ওকে বলো গে রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।

ছোটো সর্দার

কিন্তু রাজা যদি—

সর্দার

কিছু ভাবতে হবে না। চলো, আমি নিজে যাচ্ছি!

সকলের প্রস্থান

অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ

পুরাণবাগীশ

ভিতরে এ কী প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে বলো তো— ভয়ংকর শব্দ যে!

অধ্যাপক

রাজা বোধ হয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরি একটা-কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।

পুরাণবাগীশ

মনে হচ্ছে, বড়ো বড়ো থাম হুড়্‌মুড়্ করে পড়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক

আমাদের ওই পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনীনদীর জল এসে তাতে জমা হ'ত। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাৎ হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খল্ খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয়-সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।

পুরাণবাগীশ

বস্তুবাগীশ, এ কোন্ জায়গায় আমাকে আনলে, আর কী করতেই বা আনলে?

অধ্যাপক

জগতে যা-কিছু জানবার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে; এখন থেকে থেকে রেগে উঠে বলছে, 'তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি

দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আর-একটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণপুরুষের 'অন্দরমহল কোথায়?' ভাবলুম, এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক; আমার পলে ঝাড়া হয়ে গেছে, এখন পুরাবৃত্তের গাঁঠ-কাটা চলুক।—

ওই দেখতে পাচ্ছ, কে যাচ্ছে?

পুরাণবাগীশ

একটি মেয়ে, ধানী রঙের কাপড়-পরা।

অধ্যাপক

পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ওই আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে— কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে— সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চার দিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুর-বাঁধা তম্বুরা। এক-একদিন ওর চলে যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখির মতো হুশ্‌ ক'রে উড়ে পালায়।

পুরাণবাগীশ

বল কী হে! তোমার পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুকি বাধে নাকি?

অধ্যাপক

জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই পাঠশালা-পালাবার ঝোঁক সামলানো যায় না।

পুরাণবাগীশ

এখন বলো তো তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়?

অধ্যাপক

দেখার উপায় নেই, ওই জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

পুরাণবাগীশ

বল কী হে ! এই জালের আড়াল থেকে ?

অধ্যাপক

তা নয় তো কী ? ঘোমটার আড়াল থেকে যেরকম রসালাপ হতে পারে সে ধরণের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোরু বোধ হয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ

বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই তো পণ্ডিতের অভিপ্রায়।

অধ্যাপক

কিন্তু বিধাতার নয়। তিনি আসল জিনিস সৃষ্টি করেছেন বাজে জিনিসকে লালন করবার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালোবাসা দেন ফলের শাঁসকে।

পুরাণবাগীশ

আজকাল দেখছি তোমার বস্তুতত্ত্ব ধানী রঙের দিকে একটানা ছুটে চলেছে। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য কর কী করে ?

অধ্যাপক

সত্যি কথা বলব ? আমি ওকে ভালোবাসি।

পুরাণবাগীশ

বল কী হে !

অধ্যাপক

তুমি জানো না, ও এত বড়ো যে, ওর দোষগুলোও ওকে নষ্ট করতে পারে না।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার

ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেছ বুঝি! ওঁর বিদ্যের বিবরণ শুনেই আমাদের রাজা ক্ষেপে উঠেছে।

অধ্যাপক

কিরকম?

সর্দার

রাজা বলে, পুরাণ ব'লে কিছু নেই। বর্তমান কালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।

পুরাণবাগীশ

পুরাণ যদি নেই তা হলে কিছু আছে কী করে? পিছন যদি না থাকে তো সামনেটা কি থাকতে পারে?

সর্দার

রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে: মহাকাল পুরাতনকে পিছনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক

নন্দিনীর নিবিড়যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন, ধরতে পারছেন না— রেগে উঠছেন আমার বস্তুতত্ত্বর উপর।

নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ

নন্দিনী

সর্দার! সর্দার! ও কী! ও কারা!

সর্দার

কী গো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত

হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো-আনাই অস্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন হয়তো ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী

চেয়ে দেখো, ও কী ভয়ানক দৃশ্য! প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি! ওই কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে— ওই-যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি-দরজা দিয়ে?

সর্দার

ওদের আমরা বলি 'রাজার এঁটো'।

নন্দিনী

মানে কী!

সর্দার

মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক্।

নন্দিনী

কিন্তু এ-সব কী চেহারা! ওরা কি মানুষ! ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে!

সর্দার

হয়তো নেই।

নন্দিনী

কোনোদিন ছিল?

সর্দার

হয়তো ছিল।

নন্দিনী

এখন গেল কোথায়?

সর্দার

বস্তুবাগীশ, পারো তো বুঝিয়ে দাও, আমি চললুম।

প্রস্থান

নন্দিনী

ও কী ! ওই-সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি ! ওই তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়-চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। ম'রে যাই ! ওদের এমন দশা কে করলে ? ওই-যে দেখি শক্‌লু, তলোয়ার-খেলায় সব্বার আগে পেত মালা।— অনূ— প, শক্‌লু—, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানী-পাড়ার নন্দিন।— মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে।— ও কী, কঙ্কু যে ! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড়ো লাজুক ছিল ; যে ঘাটে জল আনতে যেতুম তারই কাছে ঢালু পাড়ির 'পরে বসে থাকত, ভাণ করত যেন তীর বানাবার জন্যে শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টমি ক'রে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে।— হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল !—

অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মর্চেটাই বাকি ! এমন কেন হল !

অধ্যাপক

নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লক্‌ লক্‌ করছে।

নন্দিনী

তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

অধ্যাপক

রাজাকে তো দেখেছ ? তার মূর্তি দেখে শুনছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েছে ?

নন্দিনী

হয়েছে বৈকি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক

সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভূতটি হল তার খরচ। ওই ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী

ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

অধ্যাপক

তত্ত্বর উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।

নন্দিনী

এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয় তা হলে চাই নে আমি হওয়া। আমি ওই ছায়াদের সঙ্গে চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

অধ্যাপক

রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগে রাস্তা ব'লে কোনো বালাই নেই। দেখো-না, পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন সরে পড়েছেন, ভেবেছেন পালিয়ে বাঁচবেন। একটু এগোলেই বুঝবেন বেড়াজাল এখান থেকে শুরু করে বহু যোজন দূর পর্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা।— নন্দিনী, রাগ করছ তুমি। তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

নন্দিনী

জানলা ঠেলে

শোনো, শোনো !

অধ্যাপক

কাকে ডাকছ তুমি ?

নন্দিনী

জালের-কুয়াশায়-ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক

ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে, ডাক শুনতে পাবে না।

নন্দিনী

বিশুপাগল, পাগল ভাই !

অধ্যাপক

তাকে ডাকছ কেন ?

নন্দিনী

এখনো যে সে ফিরল না ! আমার ভয় করছে।

অধ্যাপক

একটু আগেই তোমার সঙ্গেই তো দেখেছি।

নন্দিনী

সর্দার বললে, রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েছে। সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না।— ও কিসের আর্তনাদ !

অধ্যাপক

এ বোধ হচ্ছে সেই পালোয়ানের।

নন্দিনী

কে সে ?

অধ্যাপক

সেই-যে জগদ্‌বিখ্যাত গজ্জু, যার ভাই ভজন স্পর্ধা করে রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল ; তার পরে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতো

কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এল তাল ঠুকে। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম, 'এ রাজ্যে সুড়ঙ্গ খুদতে চাও তো এসো, মরতে মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাকবে। আর, যদি পৌরুষ দেখাতে চাও তো এক মুহূর্ত সইবে না। এ বড়ো কঠিন জায়গা।'

নন্দিনী

দিন রাত এই মানুষ-ধরা ফাঁদের খবরদারি করে এরা একটুও কি ভালো থাকে?

অধ্যাপক

ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ংকর বেড়ে গেছে যে, লাখো লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে? জাল তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে থাকতেই হবে।

নন্দিনী

থাকতেই হবে? মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয় তাতেই বা দোষ কী!

অধ্যাপক

আবার সেই রাগ? সেই রক্তকরবীর ঝংকার? খুব মধুর, তবুও যা সত্য তা সত্য। থাকবার জন্যে মরতে হবে এ কথা বলে সুখ পাও তো বলো। কিন্তু, থাকবার জন্যে মারতে হবে এ কথা যারা বলে তারাই থাকে। তোমরা বলো এতে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই মনুষ্যত্ব। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

পালোয়ানের প্রবেশ

নন্দিনী

আহা, ওই দেখো, কিরকম টলতে টলতে আসছে! পালোয়ান, এইখানে শুয়ে পড়ো। অধ্যাপক, দেখো-না কোথায় চোট লেগেছে।

অধ্যাপক

বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না।

পালোয়ান

দয়াময় ভগবান, জীবনে যেন একবার জোর পাই আর এক দিনের জন্যেও।

অধ্যাপক

কেন হে ?

পালোয়ান

কেবল ওই সর্দারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্যে।

অধ্যাপক

সর্দার তোমার কী করেছে ?

পালোয়ান

সমস্তই সেই তো ঘটিয়েছে। আমি তো লড়তে চাই নি। আজ বলে বেড়াচ্ছে আমারই দোষ।

অধ্যাপক

কেন ? ওর কী স্বার্থ ?

পালোয়ান

সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখদুটো উপড়ে ফেলতে পারি, যেন ওর জিভটা টেনে বের করি।

নন্দিনী

তোমার কিরকম বোধ হচ্ছে পালোয়ান ?

পালোয়ান

বোধ হচ্ছে, ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে! শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়!— যদি কোনো উপায়ে একবার— হে কল্যাণময় হরি— আঃ,

যদি একবার— তোমার দয়া হলে কী না হতে পারে— সর্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি !

নন্দিনী

অধ্যাপক, ওকে ধরো তুমি, দুজনে মিলে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অধ্যাপক

সাহস করি নে নন্দিনী। এখানকার নিয়ম-মতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী

মানুষটাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না ?

অধ্যাপক

যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা পাপ হতে পারে, কিন্তু অপরাধ নয়। নন্দিনী, এ-সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এসো। শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নীচে হরণ-শোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি।—

ওই-যে সর্দার। আমি তবে সরি। তোমার সঙ্গে কথা কই এ ও সইতে পারে না।

নন্দিনী

আমার উপরে কেন এত রাগ ?

অধ্যাপক

আন্দাজে বলতে পারি। তুমি ভিতরে ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ ; যতই সুর মিলছে না, বেসুর ততই কড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠছে।

প্রস্থান

সর্দারের প্রবেশ

নন্দিনী

সর্দার !

সর্দার

নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোঁসাইজির দুই চক্ষু— এই-যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম ! প্রভু, সেই মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই

আহা, শুভ্র প্রাণের দান, ভগবানের শুভ্র কুন্দফুল ! বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শুভ্রতা ম্লান হল না। এতেই তো পুণ্যের শক্তি আর পাপীর ত্রাণের আশা দেখতে পাই।

নন্দিনী

গোঁসাইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করো। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি !

গোঁসাই

সব দিক ভেবে যে পরিমাণ বাঁচা দরকার, আমাদের সর্দার নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু, বৎসে, এ-সব আলোচনা তোমাদের মুখে শ্রুতিকটু লাগে, আমরা পছন্দ করি নে।

নন্দিনী

এ রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি পরিমাণ-বিচার আছে ?

গোঁসাই

আছে বৈকি। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বুঝে তার ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের 'পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে

আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশি পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। এ কি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া ?

নন্দিনী

গোঁসাইজি, ভগবান তোমার উপরে এদের কোন্ উপকারের বিষম ভার চাপিয়েছেন ?

গোঁসাই

যে প্রাণ সীমাবদ্ধ নয় তার অংশ-ভাগ নিয়ে কারও সঙ্গে কারও ঝগড়ার দরকারই হয় না, আমরা গোঁসাইরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেছি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তবেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী

তবে কি এ লোকটা ওর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এই রকম আধমরা হয়েই পড়ে থাকবে ?

গোঁসাই

পড়েই বা থাকবে কেন ? কী বল সর্দার ?

সর্দার

সে তো ঠিক। পড়ে থাকতে দেব কেন ? এখন থেকে নিজের জোরে চলবার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে নিয়ে বেড়াব।— ওরে গজ্জু !

পালোয়ান

কী প্রভু ?

গোঁসাই

হরি হরি, এরই মধ্যে গলা বেশ-একটু মিহি হয়ে এসেছে ; মনে হচ্ছে, আমাদের নামকীর্তনের দলে টেনে নিতে পারব।

সর্দার

হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েছে, চলে যা সেখানে।

নন্দিনী

ও কী কথা! চলতে পারবে কেন!

সর্দার

দেখো নন্দিনী, মানুষ চালানোই আমাদের ব্যাবসা। আমরা জানি, মানুষ যেখানটাতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দিলে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গজ্জু!

পালোয়ান

যে আদেশ।

নন্দিনী

পালোয়ান, আমিও যাচ্ছি মোড়লের ঘরে। সেখানে তো তোমাকে দেখবার কেউ নেই।

পালোয়ান

না না, থাক্, সর্দার রাগ করবে।

নন্দিনী

আমি সর্দারের রাগকে ভয় করি নে।

পালোয়ান

আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ বাড়িয়ো না।

প্রস্থান

নন্দিনী

সর্দার, যেয়ো না, বলে যাও আমার বিশুপাগলকে কোথায় নিয়ে গেছ।

সর্দার

আমি নিয়ে যাবার কে ? বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে করো, ধরে নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।

নন্দিনী

এ কোন্ সর্বনেশে দেশ গো ! তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয় ? তোমরা হাওয়া, তারা মেঘ ? গোঁসাই, তুমি নিশ্চয় জানো, কোথায় আমার বিশুপাগল আছে।

গোঁসাই

আমি নিশ্চয় জানি, যে যেখানে থাক্ সবই ভালোর জন্যে।

নন্দিনী

কার ভালোর জন্যে ?

গোঁসাই

সে তুমি বুঝবে না।— আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপ-মালা ! ওই গেল ছিঁড়ে !

ওহে সর্দার, এই-যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দার

কে জানে, ও কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

গোঁসাই

ওহে, এইবার আমার নামাবলিটা-সুদ্ধ ছিঁড়বে ! বিপদ করলে ! আমি চললুম !

প্রস্থান

নন্দিনী

সর্দার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গেছ বিশুপাগলকে।

সর্দার

তাকে বিচারশালায় ডেকেছে— এর বেশি বলবার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী

আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না! বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।

সর্দার

তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে যাই। বিশুর বিপদ ঘটিয়েছ তুমিই।

নন্দিনী

আমি!

সর্দার

হাঁ, তুমিই। এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্র-দেবের আগুন! অনেককে টানবে, তার পরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরি নেই।

নন্দিনী

তাই হোক। কিন্তু একটা কথা বলে যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে কি?

সর্দার

কিছুতে না।

নন্দিনী

কিছুতে না! দেখব, তোমার সাধ্য কিসের। তার সঙ্গে আমার

মিলন হবেই, হবেই— আজই হবে। এই তোমাকে বলে দিলুম।

সর্দারের প্রস্থান

নন্দিনী

জানলায় ঘা দিয়ে

শোনো শোনো রাজা! কোথায় তোমার বিচারশালা? তোমার জালের এই আড়াল ভাঙব আমি।—

ও কে ও! কিশোর যে! বল্ তো আমায়, জানিস কি কোথায় আমাদের বিশু।

কিশোরের প্রবেশ

কিশোর

হাঁ নন্দিনী, এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে, মনটা ঠিক করে রাখো। জানি নে, প্রহরীদের কর্তা আমার মুখ দেখে কেন দয়া করলে। আমার অনুরোধে এই পথ দিয়ে বিশুকে নিয়ে যেতে রাজি হল।

নন্দিনী

প্রহরীদের কর্তা? তবে কি—

কিশোর

হাঁ, ওই-যে আসছে।

নন্দিনী

ও কী! তোমার হাতে হাতকড়ি! পাগল ভাই, তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেছে!

বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ

বিশু

ভয় নেই, কিছু ভয় করিস নে। পাগলি, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।

নন্দিনী

কী বলছ বুঝতে পারছি নে।

বিশু

যখন ভয়ে-ভয়ে পদে-পদে বিপদ সামলে চলতুম তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মতো বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী

কী দোষ করেছ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে?

বিশু

এত দিন পরে আজ সত্য কথা বলেছিলুম।

নন্দিনী

তাতে দোষ কী হয়েছে?

বিশু

কিচ্ছু না।

নন্দিনী

তবে এমন করে বাঁধলে কেন!

বিশু

এতেই বা ক্ষতি কী হল? সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি— এ বন্ধন তারই সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।

নন্দিনী

ওরা তোমাকে পশুর মতো রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে, ওদের নিজেরই লজ্জা করছে না? ছি ছি, ওরাও তো মানুষ!

বিশু

ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েছে যে— মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার লেজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।

নন্দিনী

আহা পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে! এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে!

বিশু

চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে রশিতে এই চাবুক তৈরি সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরি। যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সে কথা ওরা ভুলে যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর রাখেন।

নন্দিনী

আমাকেও এমনি করে তোমার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাক ভাই আমার! তোমার এই মার আমিও যদি কিছু না পাই তবে আজ থেকে মুখে অন্ন রুচবে না।

কিশোর

বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে পারে। সেই অনুমতি করো তুমি।

বিশু

এ যে তোর পাগলের মতো কথা।

কিশোর

শাস্তিতে তো আমাকে বাজবে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুশি হয়ে সইতে পারব।

নন্দিনী

আহা, না কিশোর, ও কথা বলিস নে।

কিশোর

নন্দিনী, আমি কাজ কামাই করেছি, ওরা তা টের পেয়েছে। আমার পিছনে ডালকুত্তা লাগিয়েছে। তারা যে অপমান করবে, এই শাস্তি তার থেকে আমাকে বাঁচাবে।

বিশু

না কিশোর, এখনো ধরা পড়লে চলবে না। একটা বিপদের কাজ করবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।

কিশোর

নন্দিনী, তা হলে বিদায় নিলুম। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে তোমার কোন্ কথা তাকে জানাব?

নন্দিনী

কিছু না। তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে।

কিশোরের প্রস্থান

বিশু

এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হোক।

নন্দিনী

মিলনে আমার আর সুখ হবে না। এ কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না যে, তোমাকে শূন্য হাতে বিদায় দিয়েছি। আর, ওই-যে বালক কিশোর, ও আমার কাছ থেকে কী বা পেলে!

বিশু

মনে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কী চাই? মনে আছে, সেই নীলকণ্ঠের পালক রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দিতে হবে?

নন্দিনী

এই-যে রয়েছে আমার বুকের আঁচলে।

বিশু

পাগলি, শুনতে পাচ্ছিস ওই ফসল-কাটার গান?

শুনতে পাচ্ছি, প্রাণ কেঁদে উঠছে।

বিশু

মাঠের লীলা শেষ হল, খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল। চলো প্রহরী, আর দেরি নয়—

গান

শেষ ফলনের ফসল এবার
কেটে লও, বাঁধো আঁটি—
বাকি যা নয় গো নেবার
মাটিতে হোক তা মাটি।

সকলের প্রস্থান

চিকিৎসক ও সর্দারের প্রবেশ

চিকিৎসক

দেখলুম। রাজা নিজের 'পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দার

এর প্রতিকার কী?

চিকিৎসক

বড়ো রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।

সর্দার

অর্থাৎ, আর-কারও ক্ষতি করতে না দিলে উনি নিজের ক্ষতি করবেন।

চিকিৎসক

ওরা বড়ো লোক, বড়ো শিশু— খেলা করে। একটা খেলায় যখন

বিরক্ত হয় তখন আর-একটা খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেলনা ভাঙে। কিন্তু প্রস্তুত থাকো সর্দার, আর বড়ো দেরি নেই।

সর্দার

লক্ষণ দেখে আমি আগেই সব প্রস্তুত রেখেছি। কিন্তু হায় হায়, কী দুঃখ! আমাদের স্বর্ণপুরী যে রকম ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছিল এমন কোনোদিন হয় নি, ঠিক এই সময়টাতেই— আচ্ছা যাও, ভেবে দেখছি।

চিকিৎসকের প্রস্থান

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল

সর্দার-মহারাজ ডেকেছেন ? আমি ঙ-পাড়ার মোড়ল।

সর্দার

তুমিই তো তিন শো একুশ ?

মোড়ল

প্রভুর কী স্মরণশক্তি! আমার মতো অভাজনকেও ভোলেন না!

সর্দার

দেশ থেকে আমার স্ত্রী আসছে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক-বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

মোড়ল

পাড়ায় গোরুর মড়ক, গাড়ি টানবার মতো বলদের অভাব। তা হোক, খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

সর্দার

কোথায় যেতে হবে জানো তো ?— বাগান-বাড়িতে, যেখানে সর্দারদের ভোজ।

মোড়ল

যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা বলে দিয়ে যাই। একটু কান দেবেন। ওই-যে ৬৯৬, লোকে যাকে বিশুপাগল বলে, ওর পাগলামিটাকে শোধন করবার সময় এসেছে।

সর্দার

কেন? তোমাদের 'পরে উৎপাত করে নাকি?

মোড়ল

মুখের কথায় নয়, ভাবে ভঙ্গিতে।

সর্দার

আর ভাবনা নেই। বুঝেছ?

মোড়ল

তাই নাকি? তা হলে ভালো। আর-একটা কথা, ওই-যে ৪৭ফ, ৬৯৬'র সঙ্গে ওর কিছু বেশি মেশামেশি।

সর্দার

সেটা লক্ষ্য করেছি।

মোড়ল

প্রভুর লক্ষ ঠিকই আছে। তবু নানান দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় নাকি— দুই-একটা ফস্‌কিয়ে যেতেও পারে। এই দেখুন-না, আমাদের ৯৫— গ্রামসম্পর্কে আমার পিস্‌শ্বশুর— পাঁজরের হাড়-ক'খানা দিয়ে সর্দার-মহারাজের ঝাড়ুবর্দারের খড়ম বানিয়ে দিতে প্রস্তুত, প্রভুভক্তি দেখে স্বয়ং তার সহধর্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে, অথচ আজ পর্যন্ত—

সর্দার

তার নাম বড়ো খাতায় উঠেছে।

মোড়ল

যাক, সার্থক হল এত কালের সেবা। খবরটা তাকে সাবধানে

শোনাতে হবে, তার আবার মৃগীরোগ আছে, কী জানি হঠাৎ—

সর্দার

আচ্ছা, সে হবে, তুমি যাও শিগ্‌গির।

মোড়ল

আর-একজন মানুষের কথা বলবার আছে— সে যদিচ আমার আপন শ্যালা, তার মা মরে গেলে আমার স্ত্রী তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছে, তবুও যখন মনিবের নিমক—

সর্দার

তার কথা কাল হবে, তুমি দৌড়ে চলে যাও।

মোড়ল

মেজো সর্দার-বাহাদুর ওই আসছেন। ওঁকে আমার হয়ে দুটো কথা বলবেন। আমার উপর ওঁর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস, প্রভুদের মহলে ৬৯ঙ'র যখন যাওয়া-আসা ছিল, তখনি সে আমার নামে—

সর্দার

না না, কোনোদিন তোমার নাম করতেও তাকে শুনি নি।

মোড়ল

সেই তো ওর চালাকি। যে মানুষ নামজাদা তার নাম চাপা দিয়েই তো তাকে মারতে হয়। কৌশলে ইশারায় লাগালাগি করা তো ভালো নয়। ওই রোগটি আছে আমাদের তেত্রিশের। তার তো দেখি আর কোনো কাজ নেই, যখন তখন প্রভুদের খাসমহলে যাওয়া-আসা চলছেই। ভয় হয়, কার নামে কী বানিয়ে বসে। অথচ ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দার

আজ আর সময় নেই, শিগ্‌গির যাও।

মোড়ল

তবে প্রণাম হই।

ফিরে এসে

একটি কথা। ও পাড়ার অষ্টআশি সেদিন মাত্র তিরিশ তন্‌খায় কাজে ঢুকল, দুটো বছর না যেতেই উপরি পাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে তো মাসে হাজার দেড়-হাজার তো হবেই। প্রভুদের সাদা মন, দেবতার মতো ফাঁকা স্তবেই ভোলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ঘটা দেখেই—

সর্দার

আচ্ছা আচ্ছা, সে কথা কাল হবে।

মোড়ল

আমার তো দয়াধর্ম আছে, আমি তার রুটি মারার কথা বলি নে; কিন্তু তাকে খাতাঞ্চিখানায় রাখাটা ভালো হচ্ছে কি না ভেবে দেখবেন। আমাদের বিষ্ণুদত্ত তার নাড়িনক্ষত্র জানে। তাকে ডাকিয়ে নিয়ে—

সর্দার

আজই ডাকাব, তুমি যাও।

মোড়ল

প্রভু, আমার সেজো ছেলে লায়েক হয়ে উঠেছে। প্রণাম করতে এসেছিল, তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে। বড়োই মনের দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্যে আমার বধূমাতা নিজের হাতে তৈরি ছাঁচিকুমড়োর—

সর্দার

আচ্ছা, পরশু আসতে বোলো, দেখা মিলবে।

মোড়লের প্রস্থান

মেজো সর্দারের প্রবেশ

মেজো সর্দার

নাচওয়ালি আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম।

সর্দার

আর, রঞ্জনের সেটা কত দূর—

মেজো সর্দার

এ-সব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোটো সর্দার নিজে পছন্দ করে ভার নিয়েছে। এতক্ষণে তার—

সর্দার

রাজা কি—

মেজো সর্দার

রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। দশ জনের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে— কিন্তু রাজাকে এরকম ঠকানো আমি তো কর্তব্য মনে করি নে।

সর্দার

রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু ওই মেয়েটাকে অবিলম্বে—

মেজো সর্দার

না না, এ-সব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনোরকম নোংরামিকেই ভয় করে না।

সর্দার

কেনারাম গোঁসাই কি জানে রঞ্জনের কথা?

মেজো সর্দার

আন্দাজে সবই জানে, পষ্ট জানতে চায় না।

কেন ?

মেজো সর্দার

পাছে 'জানি নে' এই কথা বলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সর্দার

হলই বা ?

মেজো সর্দার

বুঝছ না ? আমাদের তো শুধু একটা চেহারা, সর্দারের চেহারা। কিন্তু ওর যে এক পিঠে গোঁসাই, আর-এক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। তাই সর্দারি ধর্মটা নিজের অগোচরে পালন করতে হয়, তা হলে নামজপের বেলায় খুব বেশি বাধে না।

সর্দার

নামজপটা নাহয় ছেড়েই দিত ?

মেজো সর্দার

কিন্তু, এ দিকে যে ওর মনটা ধর্মভীরু, রক্তটা যাই হোক। তাই স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দারি করতে পারলে ও সুস্থ থাকে। ও আছে বলেই আমাদের দেবতা আরামে আছে, তার কলঙ্ক ঢাকা পড়েছে, নইলে চেহারাটা ভালো দেখাত না।

সর্দার

মেজো সর্দার, তোমারও দেখেছি রক্তের সঙ্গে সর্দারির রক্তের মিল হয় নি।

মেজো সর্দার

রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাকবে না, এখনো সে আশা আছে। কিন্তু আজও তোমার ওই তিন শো একুশকে সইতে পারি নে। যাকে দূর থেকে চিমটে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে তাকে যখন সভার মাঝ-

খানে সুহৃদ ব'লে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়, তখন কোনো তীর্থজলে স্নান করে নিজেকে শুচি বোধ হয় না।—

ওই-যে নন্দিনী আসছে।

সর্দার

চলে এসো, মেজো সদার!

মেজো সর্দার

কেন? ভয় কিসের?

সর্দার

তোমাকে বিশ্বাস করি নে; আমি জানি, তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।

মেজো সর্দার

কিন্তু তুমি জানো না যে, তোমার চোখেও কর্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু যেন মিশেছে— তাতেই রক্তিমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।

সর্দার

তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে।

উভয়ের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী

দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল। ওই কি আমাদের মিলনের রঙ! আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে।

জানলায় ঘা দিয়ে

শোনো, শোনো, শোনো! দিন রাত এখানে পড়ে থাকব, যতক্ষণ না শোনো।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই

ঠেলছ কাকে ?

নন্দিনী

তোমাদের যে অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোঁসাই

হরি হরি, ভগবান যখন ছোটোকে মারেন তখন তার ছোটো মুখে বড়ো কথা দিয়েই মারেন। দেখো নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নন্দিনী

তাতে আমার মঙ্গল হবে না।

গোঁসাই

এসো আমার ঠাকুর-ঘরে, তোমাকে নাম শোনাই গে।

নন্দিনী

শুধু নাম নিয়ে করব কী !

গোঁসাই

মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী

শান্তি যদি পাই তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে। আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে বসে থাকব।

গোঁসাই

দেবতার চেয়ে মানুষের 'পরে তোমার বিশ্বাস বেশি ?

নন্দিনী

তোমাদের ওই ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনোদিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা

থাকবে? যাও, যাও, যাও! মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যাবসা তোমার।

গোঁসাইয়ের প্রস্থান

ফাগুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল

বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন কোথায়? সত্য করে বলো।

নন্দিনী

তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

চন্দ্রা

রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস! তুই ওদের চর।

নন্দিনী

কোন্ মুখে এমন কথা বলতে পারলে!

চন্দ্রা

নইলে এখানে তোর কী কাজ? কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস!

ফাগুলাল

এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি বিশ্বাস করে এসেছি। মনে মনে তোমাকে— সে কথা থাক্। কিন্তু আজ কেমনতরো ঠেকছে যে।

নন্দিনী

হবে, তা হবে। আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েছে। তোমাদের কাছে নিরাপদে থাকত, সে কথা নিজেই বললে।

চন্দ্রা

তবে কেন আনলি ওকে ভুলিয়ে? সর্বনাশী!

নন্দিনী

ও যে বললে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা

ভালো মুক্তি দিয়েছিস ওকে।

নন্দিনী

আমি তো ওর সব কথা বুঝতে পারি নে চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বললে, বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি।— ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে মানুষ আমি তাকে বাঁচাব কী করে?

চন্দ্রা

ও-সব কথা বুঝি নে। ওকে ফিরিয়ে যদি না আনতে পারিস মরবি, মরবি। তোর ওই সুন্দর-পানা মুখখানা দেখে আমি ভুলি নে।

ফাগুলাল

চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে কী হবে? কারিগর-পাড়া থেকে দল-বল জুটিয়ে আনি। বন্দীশালা চুর্‌মার্‌ করে ভাঙব।

নন্দিনী

আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

ফাগুলাল

কী করতে যাবে?

নন্দিনী

ভাঙতে যাব।

চন্দ্রা

ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেছ মায়াবিনী! আর কাজ নেই।

গোকুলের প্রবেশ

গোকুল

সবার আগে ওই ডাইনিকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

চন্দ্রা

মারবে? তাতে ওর শাস্তি হবে না। যে রূপ নিয়ে ও সর্বনাশ করে সেই রূপটা দাও ঘুচিয়ে। খুর্‌পো দিয়ে যেমন করে ঘাস নিড়োয় তেমনি করে ওর রূপ দাও নিড়িয়ে।

গোকুল

তা পারি। একবার এই হাতুড়ির নাচনটা—

ফাগুলাল

খবরদার! ওর গায়ে হাত দাও যদি তা হলে—

নন্দিনী

ফাগুলাল, তুমি থামো। ও ভীরু, আমাকে ভয় করে, তাই আমাকে মারতে চায়। আমি ওর মারকে ভয় করি নে। কী করতে পারে করুক কাপুরুষ।

গোকুল

ফাগুলাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয় নি! সর্দারকেই তুমি শত্রু বলে জানো! তা হোক, যে শত্রু সহজ শত্রু তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমাদের ওই মিষ্টিমুখী সুন্দরী—

নন্দিনী

সর্দারকে তোমার শ্রদ্ধা! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রদ্ধা যেরকম। যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে?

ফাগুলাল

গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চলো আমার সঙ্গে।

ফাগুলাল চন্দ্রা ও গোকুলের প্রস্থান

এক দল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো, কোথায় চলেছ তোমরা?

প্রথম

ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি।

নন্দিনী

রঞ্জনকে দেখেছ ?

দ্বিতীয়

তাকে পাঁচ দিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখি নি। ওই ওদের জিজ্ঞাসা করো, হয়তো বলতে পারবে।

নন্দিনী

ওরা কারা ?

তৃতীয়

ওরা সর্দারের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্ছে।

এই দলের প্রস্থান। অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো লাল-টুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেছ ?

প্রথম

সেদিন রাতে শম্ভু-মোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

নন্দিনী

এখন কোথায় আছে সে ?

দ্বিতীয়

ওই-যে সর্দারনীদের ভোজে সাজ নিয়ে চলেছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো, ওরা অনেক কথা শুনতে পায় যা আমাদের কানে পৌঁছয় না।

এই দলের প্রস্থান। অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জানো ?

প্রথম

চুপ, চুপ!

নন্দিনী

তোমরা নিশ্চয় জানো, আমাকে বলতেই হবে।

দ্বিতীয়

আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিঁকে আছি। ওই-যে অস্ত্রের ভার নিয়ে আসছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো।

এই দলের প্রস্থান। অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী

ওগো, একটু থামো, বলে যাও রঞ্জন কোথায়।

প্রথম

শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেছে। ধ্বজাপূজায় রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো। আমরা শুরুটা জানি, শেষটা জানি নে।

প্রস্থান

নন্দিনী

জানলায় ঘা দিয়ে

সময় হয়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে

আবার এসেছ অসময়ে! এখনি যাও, যাও তুমি।

নন্দিনী

অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুনতেই হবে আমার কথা।

নেপথ্যে

কী বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

নন্দিনী

বাইরে থেকে কথার সুর তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে

আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও— এখনি যাও।

নন্দিনী

আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে

রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখনি তাকে এনে দেবে। পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী

দেবতার সময়ের অভাব নেই, পুজোর জন্যে যুগ যুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অল্প।

নেপথ্যে

আমি ক্লান্ত, ভারী ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী

বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নেপথ্যে

নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় করো না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী

আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে

ঘৃণা করো! স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনী

পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার।

দ্বার-উদ্‌ঘাটন

ও কী! ওই কে প'ড়ে! রঞ্জনের মতো দেখছি যেন!

রাজা

কী বললে? রঞ্জন? কখনোই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী

হাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন!

রাজা

ও কেন বললে না ওর নাম! কেন এমন স্পর্ধা করে এল!

নন্দিনী

জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী।—
রাজা, ও জাগে না কেন!

রাজা

ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।—

ডাক্‌ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন্‌, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

নন্দিনী

রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জানো, ওকে জাগিয়ে দাও।

রাজা

আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারি নে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।

নন্দিনী

তবে আমাকে ওই ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছি নে। কেন এমন সর্বনাশ করলে!

রাজা

আমি যৌবনকে মেরেছি— এত দিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি! মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে!

নন্দিনী

ও কি আমার নাম বলে নি?

রাজা

এমন করে বলেছিল, সে আমি সইতে পারি নি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

নন্দিনী

রঞ্জনের প্রতি

বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।—

আহা, এই-যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরি! তবে তো কিশোর ওকে দেখেছিল! সে কোথায় গেল? রাজা, কোথায় সেই বালক?

রাজা

কোন্ বালক?

নন্দিনী

যে বালক এই ফুলের মঞ্জরি রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল।

রাজা

সে যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।

নন্দিনী

তার পরে? কী হল তার? বলো, কী হল? বলতেই হবে, চুপ ক'রে থেকো না।

রাজা

বুদ্‌বুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

নন্দিনী

রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা

কিসের সময়?

নন্দিনী

আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা

আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী

তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা

তা হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথি করো নন্দিন!

নন্দিনী

কোথায় যাব?

রাজা

আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক— তাতেই আমার মুক্তি।

দলের লোক

মহারাজ, একি কাণ্ড! একি উন্মত্ততা! ধ্বজা ভাঙলেন!— আমাদের দেবতার ধ্বজা, যার অজেয় শল্যের এক দিক পৃথিবীকে অন্য দিক স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড! পূজার দিনে কী মহাপাতক!— চল্, সর্দারদের খবর দিই গে।

প্রস্থান

রাজা

এখনো অনেক ভাঙা বাকি। তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী

যাব আমি।

ফাগুলালের প্রবেশ

ফাগুলাল

বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না—
এ কে! এই বুঝি রাজা! ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চলছে! বিশ্বাসঘাতিনী!

রাজা

কী হয়েছে তোমাদের? কী করতে বেরিয়েছ?

ফাগুলাল

বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

ফিরবে কেন? ভাঙার পথে আমিও চলেছি। ওই তার প্রথম চিহ্ন— আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।

ফাগুলাল

নন্দিন, ভালো বুঝতে পারছি নে। আমরা সরল মানুষ, দয়া করো, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী

ফাগুভাই, তোমরা তো মৃত্যুকেই পণ করেছ, ঠকবার তো কিছুই বাকি রাখলে না।

ফাগুলাল

নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলো।

নন্দিনী

আমি তো সেইজন্যেই বেঁচে আছি। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ওই দেখো, এসেছে আমার বীর মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে।

ফাগুলাল

সর্বনাশ! ওই কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে আছে!

নন্দিনী

নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে— ও কখনো মরতে পারে না।

ফাগুলাল

হায় রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার! এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে!

নন্দিনী

ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার

আসার জন্যে প্রস্তুত হব, ও আবার আসবে।—

চন্দ্রা কোথায় ফাগুলাল?

ফাগুলাল

সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দারের পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস।—

কিন্তু মহারাজ, ভুল বোঝ নি তো? আমরা তোমারই বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা

হাঁ, আমারই বন্দীশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল

সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা

তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল

সৈন্যেরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা

একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল

জিততে পারবে?

রাজা

মরতে তো পারব। এত দিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি—বেঁচেছি।

ফাগুলাল

রাজা, শুনতে পাচ্ছ গর্জন?

রাজা

ওই-যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শিগ্‌গির কী

করে সম্ভব হল? আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারি নি। ঠকিয়েছে আমাকে। আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।

ফাগুলাল

আমার দলবল তো এখনো এসে পৌঁছল না।

রাজা

সর্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। আর তারা পৌঁছবে না।

নন্দিনী

মনে ছিল, বিশুপাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর হবে না?

রাজা

উপায় নেই। পথ ঘাট আটক করতে সর্দারের মতো কাউকে দেখি নি।

ফাগুলাল

তা হলে চলো নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে তার পরে যা হয় হবে। সর্দার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না।

নন্দিনী

একা আমাকেই নিরাপদের নির্বাসনে পাঠাবে? ফাগুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে দিলে। —সর্দার! সর্দার!—দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েছে। ওই মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব।— সর্দার!—

আমাকে দেখতে পেয়েছে। জয় রঞ্জনের জয়!

দ্রুত প্রস্থান

নন্দিনী !

প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

ফাগুলাল

কোথায় ছুটেছ অধ্যাপক ?

অধ্যাপক

কে যে বললে, রাজা এত দিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে— পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।

ফাগুলাল

রাজা তো ওই গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।

অধ্যাপক

তার জাল ছিঁড়েছে ! নন্দিনী কোথায় ?

ফাগুলাল

সে গেছে সবার আগে। তাকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক

এইবারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব।

প্রস্থান

বিশুর প্রবেশ

বিশু

ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায় ?

ফাগুলাল

তুমি কী করে এলে ?

বিশু

আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ওই চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়?

ফাগুলাল

সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু

কোথায়?

ফাগুলাল

শেষ মুক্তিতে।— বিশু, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে!

বিশু

ও যে রঞ্জন!

ফাগুলাল

ধুলায় দেখছ ওই রক্তের রেখা?

বিশু

বুঝেছি, ওই তাদের পরমমিলনের রক্তরাখী। এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার। হয়তো গান শুনতে চাইবে! আমার পাগলি! আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্।

ফাগুলাল

নন্দিনীর জয়!

বিশু

নন্দিনীর জয়!

ফাগুলাল

আর, ওই দেখো, ধুলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান হাত থেকে কখন খসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু

তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল— তার শেষ দান।

প্রস্থান

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।



রক্তকরবী ১৩৩৩ সালে [ ১৯২৬ ডিসেম্বরে ] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে শিলঙ-বাস-কালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে প্রথম-রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি-আকারেই পরে ইহার নাম দিয়াছিলেন 'নন্দিনী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী' নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

বর্তমান সংস্করণের 'নাট্যপরিচয়'-অংশটি রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত রক্তকরবীর পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রথম-সংস্করণ রক্তকরবীর 'প্রস্তাবনা' ১৩৩১ সালে লিখিত কবির একটি 'অভিভাষণ'। এ স্থলে সংকলিত হইল—

আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার 'নন্দিনী'র পালা-অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হলে ভিখ মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।

আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের করে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে! দশ মুণ্ড -বিশ হাত -ওয়ালা রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় সামান্য একটা বন্য বানর লেজে করে আগুন লাগায়, এই কাহিনীটি যদি কবিগুরু আজ আপনাদের এই সভায় উপস্থিত করতেন তা হলে তার গূঢ় অর্থ নিয়ে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা কলরব উঠত। সন্দেহ করতেন, কোনো-একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থাকে বুঝি বিদ্রূপ করা হচ্ছে। অথচ শত শত বছর ধরে স্বভাবসন্দিগ্ধ লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে রস আছে তাই ভোগ করে এলেন— গোপনে যে অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি করলেন না।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে চলেছে। আমার পালার রাজা-যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন,

গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি, কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া, কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

আদিকবির সাত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে, তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক ব'লে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সত্য।

ঘটনা-স্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, সে স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত তা হলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনা-স্থানের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে। তার কারণ এ নয় যে, সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই ক'রে সেই ধন-হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে। লক্ষ্মীপুরী কেন বলে না?

কারণ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে একটা মিল দেখছি তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বল প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল কেউ তা মানবে না। এটা যে বর্তমান কালেরই, হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবী কালের সামগ্রীতে কিরকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই-জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা কি সেকালের কথা না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধ'রে টান দিয়েছিল?

আরো-একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন? বাল্মীকির পক্ষে এ-সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।

বারোয়ারির প্রবীণমণ্ডলীর কাছে এ কথা বলে ভালো করলেম না। সীতাচরিত প্রভৃতি পুণ্যকথা সম্বন্ধে তাঁরা আমাকে অশ্রদ্ধাবান বলেই সন্দেহ করেন। এটা আমার দোষ নয়, তাঁদেরও দোষ বলতে পারি নে; বিধাতা

তাঁদের এই রকমই বুদ্ধি দিয়েছেন। বোধ করি সেটা আমার সঙ্গে বারে বারে কৌতুক করবার জন্যেই। পুণ্যশ্লোক বাল্মীকির প্রতি কলঙ্ক আরোপ করলুম বলে পুনর্বার হয়তো তাঁরা আমাকে একঘরে করবার চেষ্টা করবেন। ভরসার কথা, আমার দলের লোক আছেন কৃত্তিবাস নামে আর-এক বাঙালী কবি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠল। আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তারই প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনই সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এক কালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন তখনই আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল।

হঠাৎ মনে হতে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি, রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি ; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর ; আর-একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ বিরহমিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা ; মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ এক দিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আর-এক দিকে শ্রেণীগত মানুষের। রাম ও রাবণ এক দিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আর-এক দিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হলে আমি বলি, শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারি দিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর

পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁড়া হয় নন্দিনী সেখানকার নয়; মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।

—প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩২

যাত্রী গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গতঃ রক্তকরবী সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।

—যাত্রী। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

রক্তকরবীর ইংরেজি অনুবাদ *Red Oleanders* বিলাতে প্রচারিত হইলে উহার নানা সমালোচনা হয়, তৎসম্পর্কে The Manchester Guardian কাগজে কবির যে বক্তব্য মুদ্রিত হয় তাহাতে নাটকের মূল প্রসঙ্গ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত হইয়াছিল মনে হয়। The Visva-Bharati Quarterlyর কার্তিক ১৩৩২ ( October 1925 ) সংখ্যা হইতে উহা অতঃপর সংকলিত হইল।—

## RED OLEANDERS : AUTHOR'S INTERPRETATION

Some few criticisms of my *Red Oleanders* that have appeared in the English papers have convinced me that to a considerable portion of my readers in England this play of mine seems obscure in meaning. Such a fact, I believe, almost always comes as a surprise to an author, because generally a work of this nature springs from a vision that is vivid to himself and a feeling that belongs to his direct experience. It is not for me to discuss the literary qualities of this book, which, being a mere translation, can have no pretension to a permanent place as literature in a language not the author's own But I think, in justice to myself, I should make it clear that it has a definite meaning which can legitimately claim literary expression.

There was a time when, in the human world, most of our important dealings with our fellow-beings were personal dealings, and the professional element in society was never hugely disproportionate to the normal constitution of its life. Therefore, naturally, in the tradition of literature, which is the ideal expression of man's life, interactions of human relationship have so long occupied the most important position

To-day another factor has made itself immensely evident in shaping and guiding human destiny. It is the spirit of organisation, which is not social in character, but utilitarian.

Christian Europe no longer depends upon Christ for her peace, but upon the League of Nations, because her peace is not disturbed by forceful individuals so much as by organised Powers. Naturally, in all organisations, variation of personality is eliminated, and the individual members, in so far as they represent the combination to which they belong, give expression to a common type and very little to their uniqueness of individuality.

But the personal man is not dead, only dominated by the organised man. The world has become the world of Jack and Giant— the Giant who is not a gigantic man, but a multitude of men turned into a gigantic system.

I am not competent to say how Europe herself feels about this phenomenon produced by her science. Very likely her stout-hearted Jack is already busy making breaches in the walls of this fortress. But I can say, on behalf of inarticulate Asia, what a terrible reality for us is the West, whose relation to ourselves is so little human. The view that we can get of her, in our mutual dealings, is that of a titanic power with an endless curiosity to analyse and know, but without sympathy to understand; with numberless arms to coerce and acquire, but no serenity of soul to realise and enjoy.

It is an organised passion of greed that is stalking abroad in the name of European civilisation. I know that this does not represent the whole truth as to its character, and therefore the pity of it is all the greater when mainly this aspect of it is forcibly presented to us, causing the spread of dumb sadness over a vast portion of the world and the dread of a devastation of its future into an utterly bankrupt life. Such an objectified passion lacks the true majesty of human nature; it only assumes a terrifying bigness, its physiognomy blurred through its cover of an intricate network,— the scientific system. It barricades itself against all direct human touch with barriers of race pride and prestige of power. The

impersonal pressure which, from its aloofness, it applies to our living soul is enormous, ever narrowing our prospect of growth, smothering the power of initiative in our mind.

Once our people had either an Akbar or an Aurangzeb to deal with; now we have an organised avarice,— frightfully simple in its purpose, mechanically complicated in its process. Its messengers who come to us— be they Lord Birkenhead or Lord Curzon— are never for us our fellow-beings in flesh and blood, as were Julius Caesar and Antony who could easily find their immortal places in Shakespeare's drama. They are abstractions, at once far and near, and therefore awful; they are obscure to us in the dark secrecy of their political laboratory and yet grimly concrete in their grasp upon our vitals.

Therefore, it should cause no surprise to anybody if a poet, belonging to a continent swallowed by the menacing shadow of Europe, gives a prominent place among the dramatis personæ of his play to an apparition which now so powerfully occupies the imagination of a vast world consisting of non-Western races. It is not an individual, but a doom; and therefore it should never be compared to such characters as Lady Macbeth by those who wish to find a literary precedent. I am told that science has become a principal subject for some notable poets in Europe. That is natural, for science has permeated Western life; it no longer has its own cradle in the secluded cells of the learned. In a similar manner, the hungry purpose, having science for its steed, running about unchecked, trampling our life's harvest, is not an intellectual generalisation unfit for imaginative literature It is intensely real; its hot breath is upon us; its touch is all over our shrinking soul. It is the principal hero to-day in the drama of human history; and I trust I have the right to invoke it in my own play, not in the spirit of a politician, but of a poet, possibly a lyrical poet.

I am glad to find that my critics readily acknowledge that Nandini, the heroine of the play, has definite features of an individual person. She is not an abstraction, but is pursued by an abstraction, like one tormented by a ghost And this is the drama. Nandini is a real woman who knows that wealth and power are *maya*, and that the highest expression of life is in love, which she manifests in this play in her love for Ranjan. But love-ties are ruthlessly molested by megalomaniac ambition, while an acquisitive intellect plies its psychological curiosity, probing into the elusive mystery of love through vivisection.

I can assure my readers that I never meant to use this book as propaganda. It is a vision that has come to me in the darkest hour of dismay. I have a stronger faith in the simple personality of man than in the prolific brood of machinery that wants to crowd it out. This personality— the divine essence of the infinite in the vessel of the finite— has its last treasure-house in woman's heart. Her pervading influence will some day restore the human to the desolated world of man As in the animal world the physically meek has to-day inherited the earth, woman will one day prove that the meek in soul, through the sure power of love, will rescue this world from the dominance of the unholy spirit of rapacity. The joy of this faith has inspired me to pour all my heart into painting against the background of black shadows— the nightmare of a devil's temptation— the portrait of Nandini as the bearer of the message of reality, the saviour through death.

—The Visva Bharati Quarterly, Oct. 1925, pp 283-85